ছোটোদের
শ্যামাপ্রসাদ

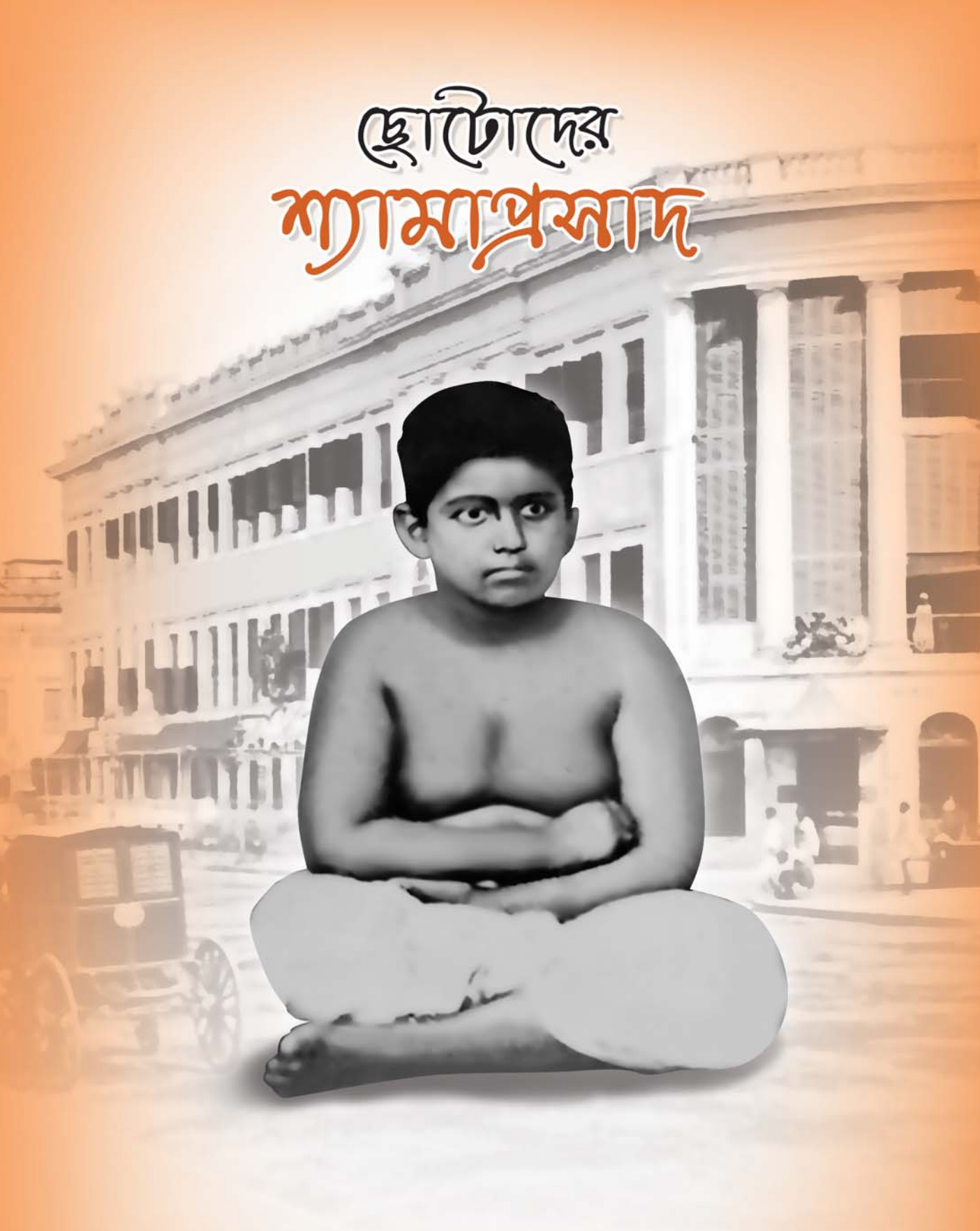

প্রথম প্রকাশ - ১লা জানুয়ারী, ২০২০

প্রকাশক, ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার, ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ

মুদ্রক, ভগবতী প্রিন্টিং হাউস

মূল্য - ৩৫ টাকা

ছোটোদের শ্যামাপ্রসাদ

রচনাঃ অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়

চিত্রণ ঃ সুরজিত চক্রবর্তী

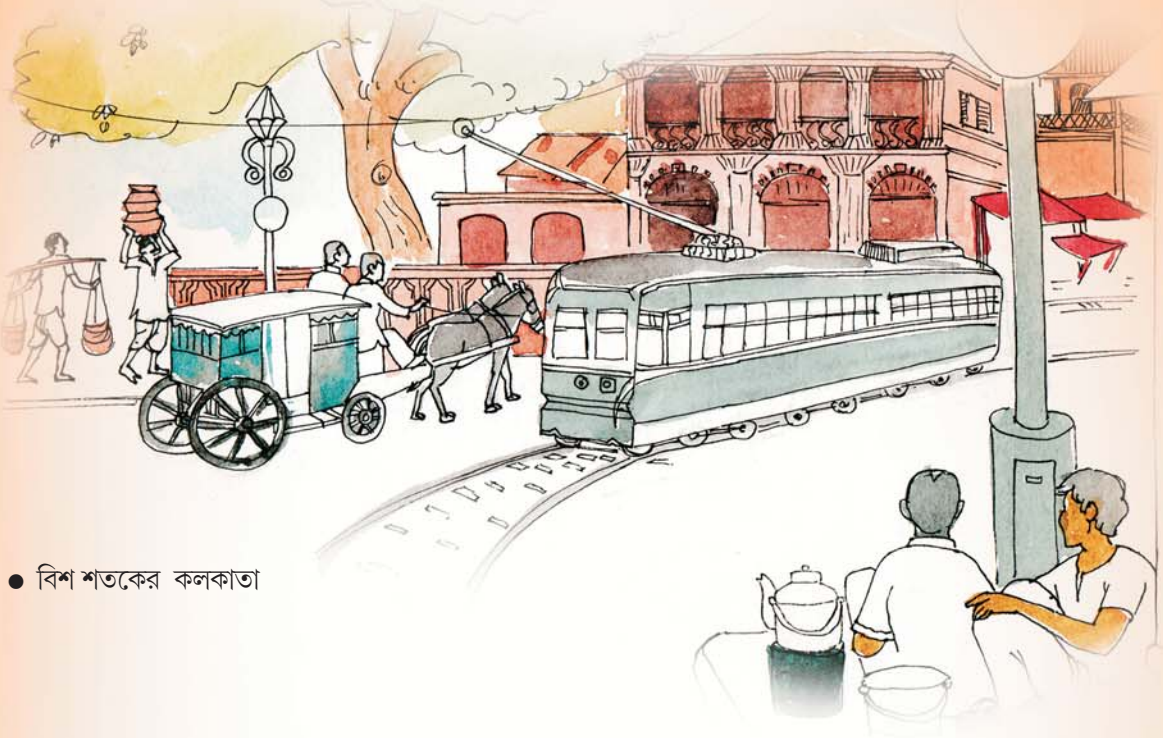

● বিশ শতকের কলকাতা

বিশ শতকের শুরুতেও ভবানীপুর ছিল কলকাতার উপকণ্ঠে একটা শহরতলি মাত্র। কলকাতার উকিল-মোক্তারদের বাড়ি-ঘর তখন সবে গড়ে উঠছে। প্রধান সড়কের নাম রসা পাগলা রোড। ঘোড়ায় টানা ট্রামের যুগ শেষ হয়ে সবে চলতে শুরু করেছে ইলেকট্রিক ট্রাম। বাস চলাচল শুরু হয়নি তখনও। ঘরে ঘরে রেডির তেলের সেজ জ্বালা বন্ধ হয়ে, সবে জ্বলতে শুরু করেছে বিজলির বাতি। তখনও রসা পাগলা রোডের দুদিকে কোথাও কোথাও খোলা মাঠ। সন্ধ্যে হলেই ডাকত শেয়াল। প্রধান যানবাহন বলতে ঘোড়ার গাড়ি। পথ চলতি ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান হাঁক পারত — সামনেওয়ালা ভা-গো-ও-ও-ও। চলনে বলনে শৌখিনতার নামগন্ধ ছিল না। সাধারণ ধুতি চাদরে জীবন কেটে যেত।

সেই শহরতলি ভবানীপুরে ১৮৬৬ সালে আসেন এম.বি.পাশ করা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জি। রসা পাগলা রোডে খুললেন ডাক্তারখানা। কিছু দূরে কামরাঙ্গা তলার গলিতে (বর্তমানে অন্নদা ব্যানার্জী লেন) তাঁর বাসা বাড়ি। স্ত্রী জগত্তারিণী ও প্রথম পুত্র আশুতোষকে নিয়ে তাঁর সংসার। এখানে আসার বছর দুই আগে ১৮৬৮-র ২৮জন বউবাজারের মলঙ্গা লেন-এ আশুতোষের জন্ম। এরপর জন্ম তাঁর দ্বিতীয় পুত্র হেমন্তকুমারের (১৮৬৬) এবং একমাত্র কন্যা হেমলতার (১৮৭৪)।

গঙ্গাপ্রসাদ আধুনিক, বিজ্ঞান মনস্ক ও উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সেকেলে গোঁড়ামি বা দেশাচারের ধার ধারতেন না।

ভবানীপুরে গঙ্গাপ্রসাদের ডাক্তারি পেশা বেশ জমে ওঠে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে সুখ্যাতি। তাই ১৮৭১ সালে রসা পাগলা রোডের জমি কিনে সেখানে বাড়ি করেন। গৃহপ্রবেশ হয় ১৮৭৩ সালের ১২ এপ্রিল। এই বাড়িতেই ১৮৭৭সালে আশুতোষ ও হেমন্তকুমারের উপনয়ন হয় এবং ১৮৮৬-তে আশুতোষের বিবাহ হয় কৃষ্ণনগরের পণ্ডিত রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের কন্যা অশেষ গুণবতী ও রূপবতী যোগমায়ার সঙ্গে।

● আশুতোষ ও হেমন্তকুমারের উপনয়ন

হেমন্তকুমারের অকাল প্রয়ান হয় (১৮৮৭) সালে। ১৮৮৯-এ শোকদগ্ধ গঙ্গাপ্রসাদের জীবনাবসান হয়। তিনি রেখে গেলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আশুতোষকে। এ বিষয়ে তাঁর নিজেরও স্বীকারোক্তি "সমস্ত সম্পত্তির সেরা সম্পত্তি আমার এই পুত্র।" পরবর্তীকালের বিরাট পুরুষ, বাঙলার বাঘ স্যার আশুতোষ, গঙ্গাপ্রসাদের ভবিষ্যৎ বাণীকে প্রমাণ করেছেন।

৭৭ নং রসা পাগলা রোডের বাড়িতে আশুতোষ-যোগমায়ার চার ছেলে তিন মেয়ের জন্ম হয়। ১৯০১ সালের ৬ জুলাই এ বাড়ির দোতলার একেবারে কোণের ঘরে জন্ম আশুতোষ-যোগমায়ার দ্বিতীয় পুত্র শ্যামাপ্রসাদের। শ্যামাপ্রসাদের বড়দিদি কমলা, বড়দাদা রমাপ্রসাদ, এরপর শ্যামাপ্রসাদ, তারপর উমাপ্রসাদ, বোন অমলা, ছোটভাই বামাপ্রসাদ ও ছোটবোন রমলা।

● ১৯০১ সালে আশুতোষ ও যোগমায়ার দ্বিতীয় পুত্র শ্যামাপ্রসাদ

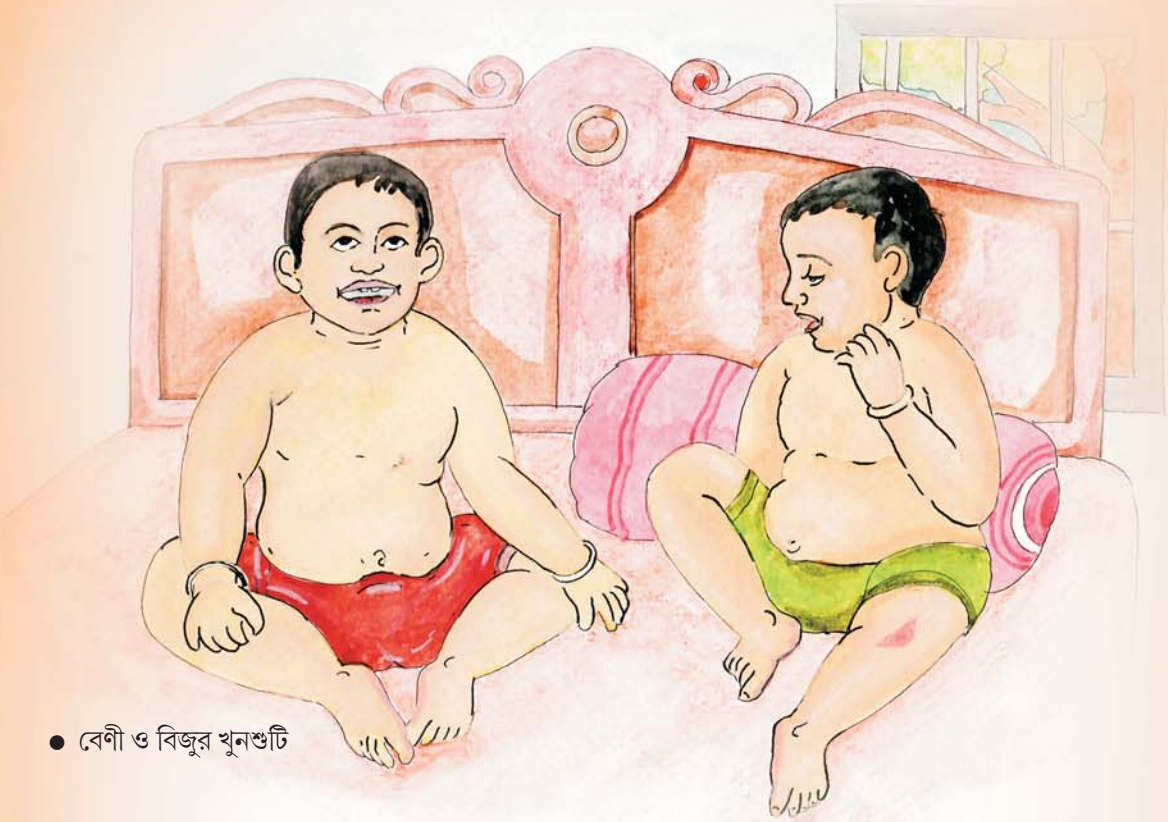

● বেণী ও বিজুর খুনশুটি

‘শ্যামাপ্রসাদ’ এই নাম হয় অনেক পরে। প্রথমে তাঁর নাম ছিল ‘বেণী’। বাড়িতে আদর করে আশুতোষ ডাকতেন। — ‘ভুতুবাবা’ বলে।

বেণী ছোটবেলা থেকেই স্বাস্থ্যবান। গড়নে ভারিক্কি। গায়ের রঙ শ্যামলা। ভরাট চেহারা। অনেকটা বাবা আশুতোষের আদল। কিন্তু তাঁর পরের ভাই মাত্র চোদ্দ মাসের ছোটো, বিজু (বিজয়ার দিন জন্ম বলে) দেখতে ফুটফুটে, সুন্দর, ফর্সা, একেবারে যেন যোগমায়ার গড়ন। বেণী ও বিজু পিঠোপিঠি ভাই বলে তাঁদের খুনশুটি লেগেই থাকত।

একবার বেণী আর বিজু তখন ছোট, দুজনেই পাশাপাশি শুয়ে ঘুমাচ্ছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল বিজুর দেখল পাশে শুয়ে নধরকান্তি মেজদা বেণী। কি খেয়াল হল বিজুর, তখন সবে দাঁত বেরিয়েছে—ঘুমন্ত বেণীর গায়ে কুটুস্ করে কামড়ে দিল বিজু। আচমকা কামড় খেয়ে ঘুম ভেঙ্গে যায় বেণীর। সে কেঁদে ওঠে। আর তার পাশে বসে সবে ওঠা দুটো দাঁত বের করে হাসতে থাকে বিজু, ভাবটা এই-কেমন মজা!

বেণীও কম যায় না। তার বয়স তখন বছর তিনেক। কিন্তু তখনই তার মনে ভারি অভিমান। কেননা, তার গায়ের রঙ কালো, আর বিজুর রঙ ফর্সা। তাই সকলেই বিজুকে আদর করে বেশি। সেবার বাবার সঙ্গে কাশী বেড়াতে গিয়ে বেণী তাই লুকিয়ে বিজুকে কামড়ে দিয়েছিল।

● বিজুকে নিয়ে মধুপুরে আশুতোষ

বিজু যে সত্যিই দেখতে সুন্দর ছিল, সে কথা ''আমার ছেলেবেলা' লেখায় বিজু এবং পরবর্তীকালের বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনীকার উমাপ্রসাদ স্বীকার করেছেন। সেবার পুজোর সময় আশুতোষ মধুপুরে বেড়াতে গেছেন। ছিলেন মধুপুরের পাথরচাপটিতে। উমাপ্রসাদ লিখছেন — ''সকালবেলা পরাম্বুলেটারে আমাকে চড়িয়ে বাবা বেড়াতে বেরিয়েছেন। নিকটেই স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। বাবার শুভানুধ্যায়ী বয়োজ্যেষ্ঠ ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

কচি শিশুর টক্‌টকে রঙ। মাথা ভরা কোঁকড়ানো চুল (এখনকার এই টাক্‌মাথাতে তখন নাকি তাই ছিল)। গুরুদাসবাবু দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসেন, জিজ্ঞাসা করেন, ছেলে না মেয়ে? বাঃ চমৎকার সুশ্রী হয়েছে তো, বাবা বলেন, ছেলে। তিনি বিশ্বাস করতে চান না। আদর করে কোলে তুলে নেন, জাঙ্গিয়া তুলে দেখেন। বাবা হো, হো করে হেসে ওঠেন। ... কিন্তু পরে, আমি কিছু বড়ো হলে, যখন তিনি এই ঘটনা তাঁর বন্ধুদের কাছে গল্প করে আমাকে লজ্জা দিতেন ও নিজে হো হো করে উচ্চৈঃস্বরে হাসতেন, - ''বিরাট পুরুষের সেই হাসি আমি আজও কানে শুনি।'' ছোট ভাই বিজুর প্রতি বেণীর হিংসের কারণ সেটাই।

বেণী অল্প বয়স থেকেই খেতে ভালবাসত। তখনও উঠে দাঁড়াতে পারে না। কোনো রকমে বসতে শিখেছে। এমন কি, ভালো করে কথাও ফোটেনি মুখে। কিন্তু একটা বড় পাকা আমের তলায় ফুটো করে বেণীর হাতে ধরিয়ে দিলে, আর দেখতে হত না। বেণী তার রস চুষতে শুরু করত। তখন সকালবেলা- আশুতোষ স্নানে যাচ্ছেন, দেখতে পেলেন, ওইটুকু ছেলের হাতে অত বড় আম।

● পাকা আম খেতে ব্যস্ত বেণী

তিনি কৃত্রিম রাগ দেখালেন। বকে উঠলেন যোগমায়াকে। তারপর চলে গেলেন স্নানে। স্নান শেষ করে ফেরার সময় দেখলেন, বেণী আমটাকে চুষে চুষে শেষ করে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলছে-ঐ যাঃ। তারপর ছোট্ট দুটি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, আরও একটা আমের জন্য।

ছোটবেলা থেকেই বেণী সবচেয়ে বেশি পছন্দ করত বাবার সঙ্গ। বুঝতে পারত, বাবার কাছে কত লোকজন আসছে বাড়িতে। হৈ-চৈ। বাবা কলকাতা হাইকোর্ট থেকে ফিরছেন, ঘোড়ার গাড়ির সহিস চিৎকার করে বলছে, সামনে ও-য়ালা-ভা-গো-ও-ও। শুনতে বেশ লাগত। বাবা কাজে গেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ছোট্ট বেণীর ভাল লাগত বাবার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে।

● আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর বাড়িতে প্রথম বিয়ের অনুষ্ঠান

বেণীর বড় দিদি কমলা ১৮৯৫-এ জন্ম। ভাইবোনদের মধ্যে সবার বড়। আশুতোষ আদর করে ডাকতেন-'রাণুমা'। ১৯০৪ সালে ন বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হল। পাত্র-শুভেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মেয়ের ছেলে, দৌহিত্র। রসা রোড়ের বাড়িতে প্রথম বিয়ে। হৈ হৈ পড়ে গেল। বিয়ের রাতে বর এলেন চতুর্দোলায় চড়ে। দেখতে সুপুরুষ। লম্বা-চওড়া। আশুতোষের বাড়িতে বিয়ের বাজনা বাজছে। চারদিকে-লোক-লস্কর। সেই মজায় মেতে উঠল বেণী ও তাঁর ভাই-বোনেরা।

আশুতোষের বড় জামাই। তাঁর ছেলে-মেয়েদের প্রথম জামাইবাবু। বিয়ের পর ঘরে বসে জামাইবাবুর সঙ্গে কত গল্প। আশুতোষও আদর করে কাছে নিয়ে বসতেন, গল্প করতেন, একসঙ্গে খেতে বসতেন।

কিন্তু বিধি বাম। এত সুখ সইল না। বিয়ের কয়েকমাস পরেই শুভেন্দুসুন্দরের টাইফয়েড হলো। তখনকার কালে প্রাণঘাতী অসুখ। তখনও টাইফয়েডের ওষুধ বের হয় নি। বেণী গেলেন বাবার সঙ্গে অসুস্থ জামাইবাবুকে দেখতে। কলকাতার মেডিকেল কলেজের সামনের গলিতে তাঁর বাড়ি। বাড়িতে ঢুকে একটা বিশাল চওড়া বারান্দা। বারান্দার শেষে একটি ঘর। জামাইবাবু শুয়ে আছেন। তাঁকে দেখে আশুতোষ বিষণ্ণ, মুখে হাসি নেই। দেশী-বিদেশী সব বড় ডাক্তারেরা এলেন। কিন্তু সেরে উঠলেন না শুভেন্দুসুন্দর। ৭৭নং রসা পাগলা রোডের বাড়িতে কান্নার রোল উঠলো। ঠাকুরমা জগত্তারিণী ও মা যোগমায়ার সে কি বুকফাটা কান্না। বাবার দিকে তাকিয়ে বেণীর মন দুঃখে ভরে গেল। বুঝতে পারল, বাড়িতে একটা ভীষণ বিপদ ঘটে গেছে। কিছু না বোঝার বয়সে বেণীর জীবনে এই প্রথম শোক।

● বাবার সঙ্গে বেণী অসুস্থ জামাইবাবাকে দেখতে গেছেন।

সেকালের বৃটিশ রাজত্বে ভারতীয়দের কাছে খুব সম্মানের উচ্চ পদ ছিল হাইকোর্টের বিচারপতি হওয়া। ১৯০৪-এ আশুতোষ হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হলেন। আশুতোষের পিতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদও চাইতেন যে, তাঁর ছেলে যেন কখনও অন্যের চাকরি না করে, তবে যদি সেই চাকরি হাইকোর্টের বিচারপতির হয়, তবে সে অন্য কথা। সেকালে আশুতোষ ওকালতি থেকে যা আয় করতেন, তা একজন জজের বেতনের চেয়ে কম নয়। কিন্তু আশুতোষ জজের পেশাকেই গ্রহণ করতে চান, কেন না, হাইকোর্টের জজ হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার পথ প্রশস্ত হবে। তাই আশুতোষ ঐ পদ গ্রহণ করলেন।

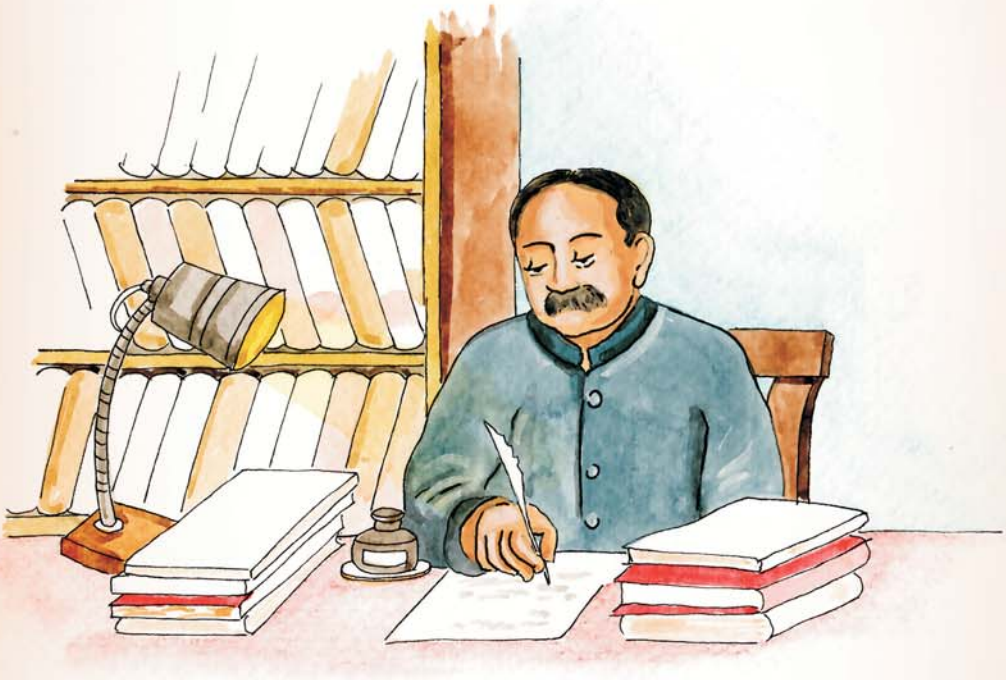

● আশুতোষ জজ হবার পর তার নিজের বাড়িতে কাজে ব্যস্ত

১৯০৬-এ আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হলেন। ৭৭ নম্বরের বাড়িতে বসত সেনেটের সভা লোকে-লোকারণ্য। কত বিশিষ্ট গুণীজন আসতেন বাড়িতে, ছোট্ট বেণী সব লক্ষ্য করেন। তার তখন ভালো লাগে বাবার কাছাকাছি থাকতে। একবার আশুতোষের শরীর খারাপ হল। বাংলার ছোটলাট স্যার এনড্রু ফ্রেজার এলেন তাঁকে দেখতে। পথে ভিড় লোকজন দাঁড়িয়ে গেছে। ছোট্ট বেণীর চোখে ধরা পড়ে তাও। বাবাকে কেন্দ্র করেই তার আনন্দের জগৎ।

● ৭৭নং বাড়িতে স্রেনেট সভা লোকে-লোকারণ্য

১৯০৬-এ উপাচার্য আশুতোষ স্থির করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে সিমলা যাবেন। সঙ্গে যাবেন তাঁর বড় পুত্র রমাপ্রসাদ। আশুতোষের আদরের ভুনুবাবা। সব শুনে বেণীর মাথাতেও সিমলা যাবার ভূত চাপল। বেণীকে সকলে অনেক বোঝালেন কিন্তু অনড় বেণী সে যাবেই। বড়দা যাবে আর সে যাবে না, সে কি হয়। তাকে সিমলা যাওয়ার থেকে নিরুৎসাহ করা গেল না। অতএব, বাধ্য হয়ে আশুতোষও সম্মত হলেন। বেণীর আনন্দ আর ধরে না। তার জন্য এল নতুন জামা-কাপড়, জুতো। বাঁধা-ছাঁদা শেষ করে দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে আশুতোষ পৌঁছলেন হাওড়া স্টেশনে। পঞ্জাব মেল-এ যাওয়া। হাওড়া স্টেশনে লোকজন, ভিড়, হৈ-চৈ। চারদিকে কত আলো। আশুতোষকে ট্রেনে চাপাতে এসেছেন অনেকে।

● হাওড়া স্টেশনে বেণী ও ভুতুবাবা

বাঁশি বেজে উঠল পাঞ্জাব মেলের স্টীম এঞ্জিনের। ট্রেন ছাড়বে এবার। হঠাৎ বেণী যেন কেমন বোধ করতে লাগলো। মা-কে ছেড়ে সে যেন চলে যাচ্ছে কত দূরে। কেমন করে উঠল তার মন। অমনি চুপিচুপি বাবার কাছে গিয়ে বললে "আমি যাব না। আমি মার কাছে ফিরে যাব। আমাকে পাঁচটা টাকা দিন।" অবাক হলেন আশুতোষ। তবু জোর করলেন না। ছেলের হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে তাকে ফেরত পাঠালেন ভবানীপুরে। বেণী যখন ফিরে এলো, তখন রাত হয়েছে। ভবানীপুরে ৭৭ নম্বরের দোতলার ঘরের বিছানায় শুয়ে যোগমায়াদেবীও ভাবছিলেন বেণীর কথা। সে কি করে থাকবে ইত্যাদি। এমন সময় চুপিসারে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো বেণী।

● হাওড়া স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরে এল বেণী

আশুতোষের আমলে বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকার নিয়ম ছিল না। রাত ৯টার মধ্যে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়া। ৭৭ নম্বর বাড়ির তিনতলার কোণের ঘরে একটা একানে খাটে শুতেন আশুতোষ। কাজ সেরে শোবার সময় গলার পৈতে খুলে খাটের উপরে টাঙিয়ে রাখতেন। সেই ঘরের অন্য আর একটা খাটে শুতেন তাঁর তিন পুত্র-মেজ বেণী, সেজ বিজু ও ছোট পচু (বামাপ্রসাদ)। ঘরের আর এক কোনে একটা সিন্দুকের ওপর ছিল কালো রঙের পালিশ করা কাঠের বাক্স। বাক্সের ভিতরে একটা গোলাকার ছোট যন্ত্র, যার গায়ে ছোট ছোট অজস্রকাঁটা। সেই যন্ত্রের হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দম দিলে টুংটুং করে অতি মধুর সুরে বাজত। সেই বাজনা শুনতে শুনতে ছেলেরা ঘুমিয়ে আবার ভোরে চারটের সময় ঘুম থেকে উঠে, হাতের কাজ সেরে বেড়াতে যাবার আগে পৈতেটা গলায় পরে নিতেন আশুতোষ। তখন বাইরে ফুটে উঠত সকালের আলো। বেরোবার আগে ছেলেদের ঘুম থেকে তুলে দিয়ে যেতেন। তাঁরাও চোখ মুখ ধুয়ে যথারীতি পড়তে বসে যেত। কোনোদিন পড়তে বসতে দেরি হয়ে গেলে শুনতে পেত চাউলপট্টি মোড় থেকে আশুতোষের গাড়ির শব্দ, আর গাড়োয়ানের হাঁক-সামনে ওয়ালা ভা-গো-ও-ও, তখন ছেলেরাও বই নিয়ে এক মনে পড়তে শুরু করতো।

শ্যামাপ্রসাদ (বাঁ দিকে), উমাপ্রসাদ (দাঁড়িয়ে),
অমলা (মাঝখানে) এবং রমাপ্রসাদ (ডানদিকে)
— ১৯০৫-এর ছবি

● বেণীর প্রথম শিক্ষ্যালাভ শিক্ষক প্রিয়নাথবাবু

বেণীর প্রথম অ-আ-ক-খ শেখার শুরু বাড়িতে শিক্ষক প্রিয়নাথ বসুর কাছে। তিনি পড়াতেন ফার্স্ট বুক আর বর্ণপরিচয়। প্রিয়নাথের গড়ন রোগা-পাতলা, দাড়ি গোঁফ কামানো। পরণে ধুতির ওপর ফতুয়া-চাদর, পায়ে চটি, গম্ভীর, রুক্ষ মেজাজ। পরে তাঁর গৃহশিক্ষক হয়ে এলেন সৌমদর্শন মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। লম্বা দাড়ি, পরণে ধুতির ওপর কোট, পায়ে জুতো, স্বভাবে শান্ত। মাটির মানুষ, সুন্দর গল্প বলতেন। বেণীর বড়ো পছন্দের শিক্ষক। তিনি একদিন পড়াতে না এলে বেণী অস্থির হয়ে পড়তো। কোথাও বেড়াতে গেলে, বিশেষ করে মধুপুরে তাঁকে নিয়ে আসর জমে উঠত। তাঁর স্বভাব ছিল চোখে কাপড় বেঁধে ঘুমানো। একবার মধুপুরে সেইরকম ঘুমন্ত অবস্থায় বেণী ও তাঁর ভাইরা কাঁচি দিয়ে তাঁর লম্বা দাড়ি ছেঁটে দিয়েছিলো। ঘুম থেকে উঠে দাড়িতে হাত বোলাতে গিয়ে তিনি টের পেয়ে খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল বেণী ও তার ভাইরা সেই অর্থে দুষ্টু নয়, বালকসুলভ চপলতায় এই কান্ড ঘটিয়েছে। এমনই ক্ষমাসুন্দর ছিলেন তিনি।

● বেণী ও ভাইদের বালক সুলভ চপলতা

১৯০৫-এ ভবানীপুরের কাঁসারি পাড়ায় খুলল মিত্র ইনস্টিটিউশন। সভাপতি আশুতোষ। প্রধান শিক্ষক সতীশচন্দ্র বসু। বেণী তখন চার বছরের শিশু। তার বড় দাদা রমাপ্রসাদ স্কুলে যাবে, আর সে যাবে না, সে কি করে হয়। অতএব কাপড়-চোপড়ে বন্দী হয়ে বেণীর স্কুলে যাওয়া। সেখানে গিয়ে সে খুব পড়াশুনো করতো তাও নয় তবু যাওয়া চাই। তবে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ক্লান্ত হয়ে পড়তো।

বেণী ছেলেবেলায় খুব দুরন্ত ছিল। ছিল সাহসীও। মারপিট করতে এতটুকুও ভয় পেতো না। কাউকে অকারণে রাগিয়ে দিয়ে মজা পেতো। তাদের বাড়িতে তার অন্য ভাইদের জন্য কোন কিছু এলে, তারও সেটা চাই। না পেলে রেগে যেতো। ছেলেবেলায় পড়া শিশুপাঠ বইয়ে ছিল বেণীর গল্প, তাতে লেখা ছিল-বেণী বড় দুরন্ত ছেলে। তার সহপাঠীরা সেদিকে ইঙ্গিত করে বলতো, এই সেই বেণী। এমন মন্তব্যে সে বিরক্ত হতো। শেষ পর্যন্ত বেণী নামটাই তার অপছন্দ হয়ে গেল। শেষে বাবাকে বললো বেণী, এই নামটাই বদলে ফেলতে হবে। আশুতোষ তখন তার নাম রাখলেন শ্যামাপ্রসাদ।

● বেণী তার দাদার সাথে প্রথম স্কুলে যাওয়া

এ কথা স্মরণ করে পরিণত বয়সে তিনি ডায়েরীতে লিখেছিলেন-তখন থেকে সব ভায়েদের 'প্রসাদ' দেওয়া নাম রাখা ঠিক হল।

১৯১২ সালে মধুপুরে আশুতোষ নতুন বাড়ি করলেন — 'গঙ্গাপ্রসাদ হাউস'। শ্যামাপ্রসাদের তখন এগারো বছর বয়স। তার আনন্দ আর ধরে না। বাড়িতে ঠাকুমা, বাবা, মা, আর তারা সাত ভাইবোন। পুজোর বা বড়দিনের ছুটিতে সকলে মধুপুরে আসতেন। আসতেন আশুতোষের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও। যেমন বহুবল্লভ শাস্ত্রী। খুব খাইয়ে লোক ছিলেন। একাদশীর দিন লুচি খেতেন। তবে মাংস হলে কথাই নেই। মাংসের ঝোলে লুচি ডুবিয়ে খেতে ভালবাসতেন। ঘুমানোর সময় নাক ডাকতেন। তখন নাক থেকে নানারকম শব্দ বের হত। ভারী মজা লাগত শ্যামাপ্রসাদের সেই বিচিত্র নাসিকা ধ্বনি শুনতে। খুব সুন্দর গল্প বলতে পারতেন শাস্ত্রী মশায়।

কত লোক বাড়িতে যাওয়া-আসা করতেন, বাড়ি গম্‌গম্‌ করত। শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর অন্য ভাইরা আবৃতি করতেন, শুনতেন আশুতোষ। বাড়িতে কোন অতিথি এলে আশুতোষ না খাইয়ে ছাড়তেন না। মিষ্টি খাওয়ানো তো চাই-ই। এতে তাঁর খুব তৃপ্তি হত।

শ্যামাপ্রসাদ ডানদিকে (বসে), বাঁদিকে উমাপ্রসাদ (বসে), বামাপ্রসাদ দাঁড়িয়ে (বাঁ দিকে), উমাপ্রসাদ (মাঝখানে দাঁড়িয়ে), মাঝে ঠাকুরমা জগত্তারিণী, অমলা (ডানদিকে দাঁড়িয়ে)

— ১৯০৮-এর ছবি

একবার মধুপুরের বাড়িতে এলেন আশুতোষের বন্ধু হীরালাল বাঁড়ুয্যে। শ্যামাপ্রসাদ তাঁকে জ্যেঠামশাই বলে ডাকতেন। দারুন গল্প বলতে পারতেন। তাই শ্যামাপ্রসাদের বড়ো পছন্দের ছিলেন। খুব বাবু সেজে থাকতেন তিনি। গায়ে আতর বা গোলাপজল না দিয়ে কখনো বাইরে বেরোতেন না। কুঁচনো কাপড় পরণে, গায়ে বালাপোষ, তেমনি সুপুরুষ চেহারা। তবে একেবারেই স্নান করতেন না। দশ বছর অন্তর স্নান করা তাঁর অভ্যাস ছিল। একবার তিনি শীতকালে মধুপুরে এসেছেন। আশুতোষের সঙ্গে গল্প করতে করতে তাঁরা বাড়ির কুয়োর দিকে চলে গেছেন। আশুতোষ আগে মালিকে বলে রেখেছিলেন। এখন ইঙ্গিত করলেন। হীরালালবাবু কিছু বুঝে ওঠার আগেই মালি কুয়ো থেকে এক বালতি জল তুলে তাঁর গায়ে ঢেলে দিল। হীরালালের গায়ের ওভারকোট, বালাপোষ, জামা সব ভিজে গেল। শীত ও ঠান্ডার ভয়ে তখন তাঁর মারা যাবার মত অবস্থা।

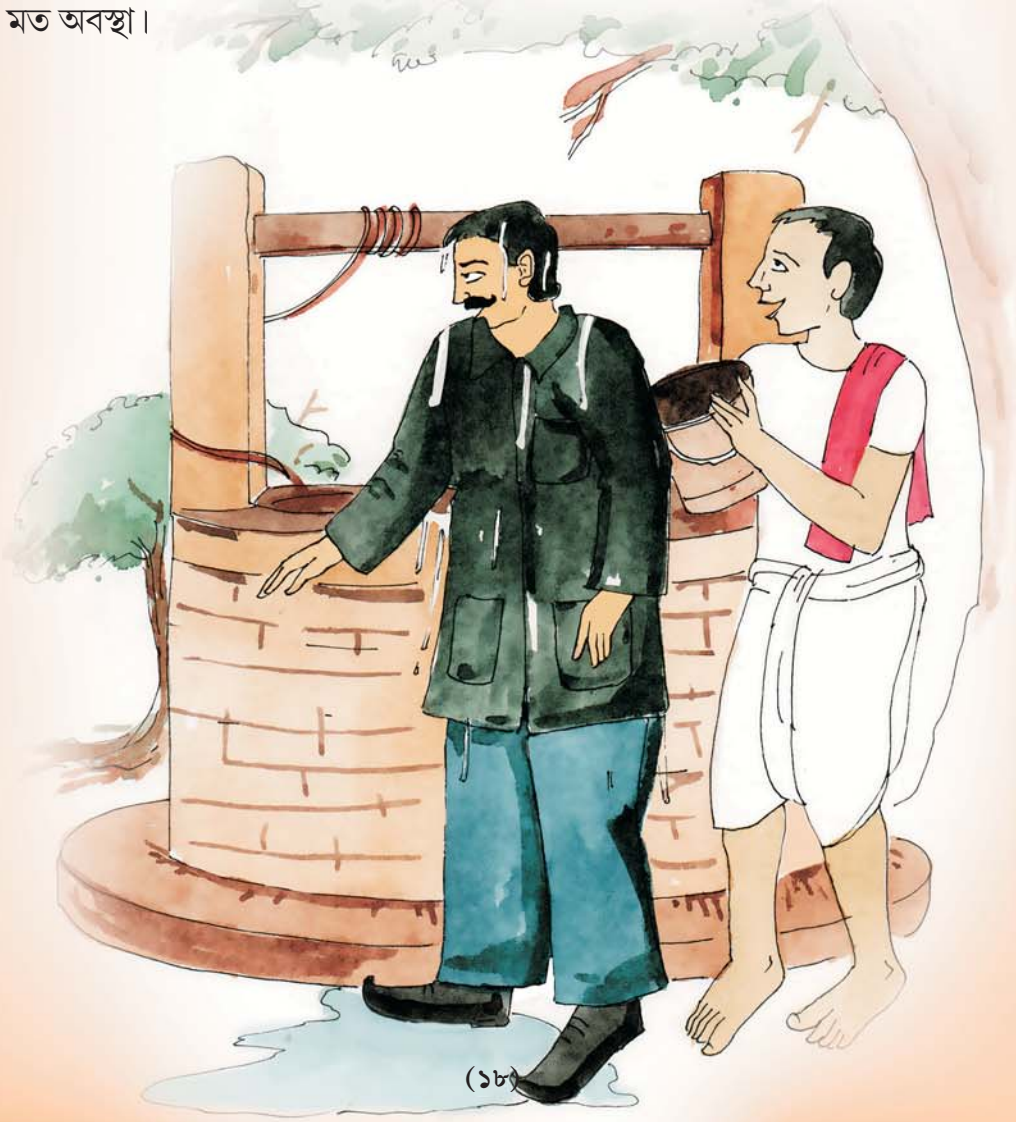

● হীরালাল বাবুকে কুয়োর ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে দিলো মালি

যোগেন মজুমদারের ছিল সিগারেটের নেশা। সিগারেটের নেশায় কাবু হয়ে হয় যেতেন পায়খানায়, নয় অকারণে স্টেশন যাচ্ছি বলে পালাতেন। এই যোগেনবাবুকেই চোখ বন্ধ করে হাঁ করিয়ে রাখতেন শ্যামাপ্রসাদ। তাঁর মুখে রসগোল্লা না দিয়ে ফেলতেন নিজেরই মুখে। রাঁধুনি বামুন উড়ে। তাকে জব্দ করার জন্য তার শোয়ার খাঁটিয়ার সঙ্গে ঘুমন্ত রাধুনির টিকি বেঁধে রেখে দিতেন। মধুপুর ছিল তাদের সব পেয়েছির দেশ। অফুরন্ত আনন্দ, হাসির সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবে ঠাসা, গল্পে মশগুল এক আনন্দময়পুরী।

সপ্তাহের শেষে কলকাতার কাজ সেরে আশুতোষ রাতের পাঞ্জাব মেল ধরে আসতেন মধুপুর। ট্রেন এসে মধুপুরে পৌঁছত প্রায় মধ্যরাতে। গঙ্গাপ্রসাদ হাউসে তাঁর জন্য বিছানা পাতা থাকত। অত রাতে তাঁর সন্তানেরা ঘুমিয়ে পড়ত। কিন্তু ঘুম ভেঙে যেত শ্যামাপ্রসাদের নির্জন রাতে দূর থেকেই শোনা যেত ঘোড়ার গাড়ির শব্দ। কানে আসত বাড়ির বড় গেট খোলার আওয়াজ। আনন্দে মন ভরে উঠত শ্যামাপ্রসাদের। বাবা এসেছেন। কিন্তু আশুতোষ মধুপুরে থাকতেন মাত্র দিন দুয়েক।

● গভীর রাতে আশুতোষ মধুপুরে ফিরলেন ঘোড়ার গাড়িতে

রবিবারের সন্ধ্যার গাড়িতে আবার কলকাতায় ফিরে যেতেন। তখন সবই যেন ম্লান হয়ে যেত। শ্যামাপ্রসাদ সেই বয়সেও বুঝতে পারতো — বাবার থাকা এবং না থাকার মধ্যে কত পার্থক্য।

১৯১৬ সালের পুজোর ছুটিতে আশুতোষ সপরিবারে গেলেন এলাহাবাদে। শ্যামাপ্রসাদের তখন ১৫ বছর বয়স। সেখান থেকে আগ্রা। পরিবারের সকলে তো আছেনই, সেই সঙ্গে আছেন আশুতোষের অন্তরঙ্গ বন্ধু বিরাজমোহন মজুমদার। তিনি হাইকোর্টের উকিল, আর ল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল। আগ্রা থেকে ঘোড়ার গাড়িতে করে ফতেপুর সিক্রি ১২/১৪ মাইল রাস্তা। টাঙ্গায় বিরাজবাবুর বসতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল। তিনি ভাল হিন্দি বলতেও পারতেন না। তাই ভাঙ্গা হিন্দিতে টাঙ্গাঅলাকে বললেন, আরে ভায়া, তুমারা গাড়িতে পাছামে বেদনা হো গিয়া। রসিক টাঙ্গাঅলার তৎক্ষনাৎ উত্তর - হুজুর, ডালিম তো নেহি হুয়া? তখনি টাঙ্গাতে উঠল হাসির হুল্লোর। সে হুল্লোড়ের মধ্যমণি শ্যামাপ্রসাদ।

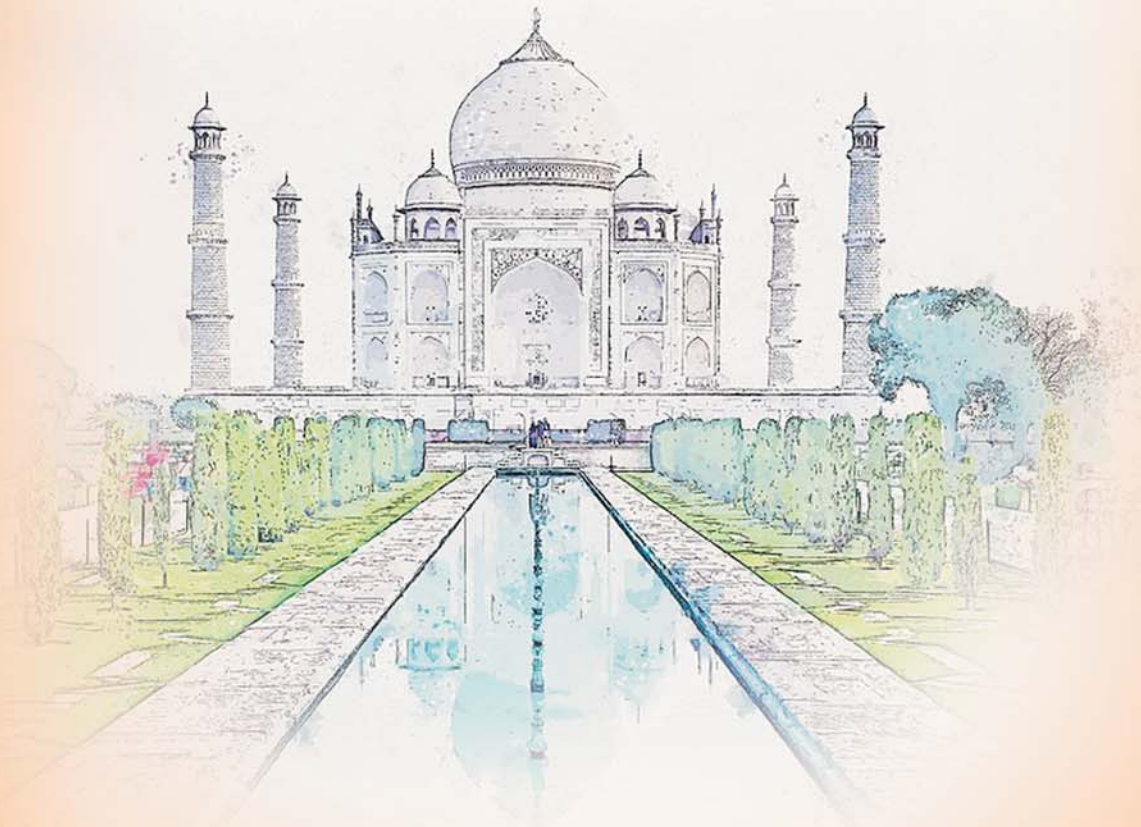

● ১৯১৬ সালে তাজমহল

● কাশীর গঙ্গাঘাটে শ্যামাপ্রসাদ ও রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ

সেবার আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি ঘুরে তাঁরা এসে পৌঁছলেন কাশীতে। সেখানে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন পণ্ডিত রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ। খুব গোঁড়া মানুষ। সন্ধ্যা-আহ্নিক করতেন নিয়মিত। তা না করে জলগ্রহণ করতেন না। একদিন সন্ধ্যা বেলায় শ্যামাপ্রসাদ তার সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে গেছে। কচুরীগলি থেকে কিছু কচুরী মিষ্টি তিনি কিনলেন। শ্যামাপ্রসাদ ভাবলো বাড়িতে ফিরে হয়তো এসব খাওয়া দাওয়া হবে। তখন গঙ্গার ধারে ফুরফুরে বাতাস উঠেছে। শ্যামাপ্রসাদ দেখলো, গঙ্গার ঘাটে অন্ধকারে বসে তিনি গোগ্রাসে খেতে শুরু করলেন। শ্যামাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলো, আজকে সন্ধ্যা-আহ্নিক কি হল? পণ্ডিত রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ হেসে বললেন, বিশ্বনাথের দেশে ওসবের প্রয়োজন হয় না।

সেকালে কাশীতে এসে অনেকেই কিছু না কিছু দান করে যেতেন বা ত্যাগ করতেন। বিদ্যাভূষণ নাকে নস্যি নিতেন। তিনি ঘোষণা করলেন, তিনি কাশীতে এসে নস্যি নেওয়া ত্যাগ করবেন। তাঁর এই ত্যাগে সবাই খুবই আশ্চর্য হলেন। সন্দেহ নেই, এটা তাঁর পক্ষে একটা বড় ত্যাগ। দিন দুই তাঁরা কাশীতে ছিলেন। বিদ্যাভূষণও নস্যি নেন নি। কিন্তু যাবার দিন ট্রেন যখন কাশীর গঙ্গার ব্রিজ পার হচ্ছে, বিদ্যাভূষণ প্রকাণ্ড হাঁ করে নাকে নস্যি গুঁজলেন। শ্যামাপ্রসাদ অবাক-এ কি করলেন!

বিদ্যাভূষণ ধীরে ধীরে ভেবেচিন্তে উত্তর দিলেন - কেন? আমি বলেছিলাম যতদিন কাশীতে থাকব নস্যি নেব না। এখন কাশী ছেড়ে যাচ্ছি যখন, তখন আর কথা রাখার প্রশ্ন ওঠে না।

শ্যামাপ্রসাদের স্বাস্থ্য বয়সের তুলনায় ছিল ভারিক্কি। কতাবার্তায় ছিল গাম্ভীর্য। তাই প্রকৃত বয়সের তুলনায় তাকে বড় দেখাত। কিন্তু প্রকৃতই তো সে তখনো বড় হয় নি। তাই বাড়িতে ভাইদের সঙ্গে হৈ চৈ করতো। কিন্তু সবাই তাকে বিশেষ সমীহ করত। ছেলেদের দলে থেকেও যেন সে দল ছাড়া।

● শ্যামাপ্রসাদ ১৮ বছর বয়সে

অল্প বয়সে নেতৃত্ব দেবার সহজাত ক্ষমতা তার ছিল। বয়স কম হলেও ভারিক্কি গড়ন ও গাম্ভীর্য তার চেহারায় ফুটিয়ে তুলত এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। নানা ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার মধুপুরের একটি ঘটনা। তখন বৃটিশ রাজত্ব। সেকালের মধুপুরেও ছিল কিছু অ্যালো-ইন্ডিয়ানদের বাস। রেল বা সরকারী দফতরের উঁচু পদে তখন তাঁরাই একচেটিয়া। স্থানীয়েরা তাঁদের বলতো ফিরিঙ্গী। ফিরিঙ্গীরা সাধারণ ভারতীয়দের সঙ্গে প্রায়শই ভদ্র আচরণ করতেন না। একবার শ্যামাপ্রসাদ, উমাপ্রসাদ ও অন্য কয়েকজন মিলে মধুপুর থেকে ফিরছেন।

সন্ধ্যাবেলা। স্টেশনে এসে তারা দেখলে, ট্রেন আসতে তখনও কিছু দেরী। তাই তারা বসতে গেল রেলের ওয়েটিং রুমে। দেখলো, একটিও চেয়ার খালি নেই। দু-চারজন যাত্রী বসার জায়গা না পেয়ে এদিকে ওদিকে ঘোরাফেরা করছেন। অথচ, একজন ফিরিঙ্গী জুতো সমেত পা একটা বড় বেঞ্চে তুলে আরাম করে সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে আছেন। শ্যামাপ্রসাদ তাঁকে উঠে বসতে অনুরোধ করলো। কিন্তু তিনি পাত্তাই দিলেন না। শুয়েই রইলেন, শুরু হয়ে গেল দুজনের কথা কাটাকাটি। এদিকে উমাপ্রসাদ ও আর এক বন্ধু ফিরিঙ্গীর ছড়ানো পায়ের ওপর বসে পড়লো। আর শ্যামাপ্রসাদও তখনই তার ভারী শরীর নিয়ে বসে পড়লো ধপাস্ করে ফিরিঙ্গির পেটের ওপরে। আর্তনাদ করে উঠলেন ফিরিঙ্গি।

● ফিরিঙ্গির গায়ে বসে পরলেন শ্যামাপ্রসাদ

আশুতোষও তাঁর ভুতুবাবার ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছিলেন। এলাহাবাদ থেকে পুজোর ছুটি কাটিয়ে তাঁরা কলকাতায় ফিরলেন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদকে আবার পিতার নির্দেশে আসতে হল মধুপুরে। একা নয়, বড়দিদি কমলাকে নিয়ে। থাকতে হবে প্রায় চার-পাঁচ মাস। ১৯১৬ সাল। ক্লাসের হিসেবে তাঁর সেবার ম্যাট্রিক দেবার কথা। কিন্তু তখনও তার ষোল বছর পূর্ণ হয়নি। তখনকার নিয়মই ছিল ষোল পূর্ণ না হলে ম্যাট্রিক দেওয়া যাবে না। তাই শ্যামাপ্রসাদকে অপেক্ষা করতে হলো আরও দু বছর ১৯১৮ সাল পর্যন্ত। নিশ্চিত হয়ে শ্যামাপ্রসাদ মধুপুরে কাটিয়েছিল নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত। তারই উপর দিদির ভার ও দায়িত্ব। নিজেকে খুব বড় বলে মনে হত শ্যামাপ্রসাদের। সবচেয়ে সন্তোষ এই যে, বাবা তাকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন।

কিন্তু ১৯১৮-তে শ্যামাপ্রসাদকে ম্যাট্রিক দিতে হল। কেন না, ১৯১৭তে দু-দুবার ম্যাট্রিকের প্রশ্নপত্র আউট হয়ে গেল। যাদের কম বয়স ছিল তারা সুযোগ পেয়ে গেল। শ্যামাপ্রসাদও সুযোগ পেল। তবে পরীক্ষার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ মধুপুরে থেকে এসে তাকে বসতে হল পরীক্ষায়। দশ টাকার জলপানি পেয়ে পাশ করেছিল শ্যামাপ্রসাদ। ১৯২১-এ বি.এ অনার্সের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। আই.এ ও বি.এ দুই পরীক্ষাতেই সাহিত্যে প্রথম হওয়ায় সুবাদে পেল বঙ্কিমচন্দ্র রৌপ্য ও স্বর্ণপদক।

সাম্মানিক স্তরে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে ভাল ফল হলেও স্নাতকোত্তরে ঘটে গেল আমূল পরিবর্তন। পিতা আশুতোষের নির্দেশে এম.এ-তে তার বিষয় হল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। সেকালের নিয়ম ছিল, এম.এ-তে দুটি পেপারের পরিবর্তে গবেষণাও করা যেত। শ্যামাপ্রসাদ গবেষণায় মন দিল। তার বিষয় হল — বাংলার রঙ্গালয়। এই বিষয়ে গিরিশ চন্দ্রের সামাজিক নাটক নিয়ে আলোচনা করলেন বিস্তারিত। ১৯২৩- পাশ করলো এম.এ। এবারও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। এবার পিতা আশুতোষের পথ ধরে তিনি পড়লেন বি.এল। এক্ষেত্রেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। এরপরে ১৯২৬-এ ব্যারিস্টারি পড়তে যান বিলেত। লণ্ডনের লিনকনস্ ইন্ থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন ১৯২৭-এ। এখানেই শ্যামাপ্রসাদের জীবনে প্রথাগত শিক্ষার সমাপ্তি।

কিন্তু তারও আগে দূরদর্শী আশুতোষ চিনতে পেরেছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্রকে। তাই আয়োজন করেছিলেন পুত্রের নানা বিদ্যালাভের। এই উদ্দেশ্যেই স্যার আশুতোষ তাঁর বাড়ি থেকে মাসিক সচিত্র সাহিত্য পত্রিকা 'বঙ্গবাণী' প্রকাশের উদ্যোগ নেন। কিন্তু পত্রিকা পরিচালনায় তিনি মাথা ঘামালেন না। এগিয়ে দিলেন পুত্রদের। পিতার আদেশে ঝাঁপিয়ে পড়লেন-রমাপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ, উমাপ্রসাদ। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ফাগুন মাস বঙ্গবাণীর প্রথম প্রকাশ। প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন কবিতা 'বাণী বিনিময়'—

মা, যদি তুই আকাশ হতিস্,
আমি চাঁপার গাছ,
তোর সাথে মোর বিনি-কথায়
হত কথার নাচ।
তোর হাওয়া মোর ডালে ডালে
কেবল থেকে থেকে
কত রকম নাচন দিয়ে
আমায় যেত ডেকে।

প্রবন্ধ, কবিতায়, গানে বিশ্বকবি ভরিয়ে দিলেন বঙ্গবাণীর ডালি। এগিয়ে এলেন শরৎচন্দ্রও। প্রথম লিখলেন দুটি ছোট গল্প 'মহেশ' (আশ্বিন ১৩২৯) এবং 'অভাগীর স্বর্গ' (মাঘ ১৩২৯)। তারপর ফাগুন, ১৩২৯ থেকে লিখতে শুরু করলেন ধারাবাহিক উপন্যাস 'পথের দাবী'। তখন ভারতে ইংরেজদের রাজত্ব। অতএব পথের দাবী ইংরেজদের নজরে পড়ল। তাঁরা ঠিক করলেন, বঙ্গবাণী বাজেয়াপ্ত করা হবে। কিন্তু জজের বাড়ি বলে কথা। হঠাৎ কিছু করতে তাঁদের সাহসে কুলোল না। অতএব তাঁদের মতের পরিবর্তন হল। তবে বই হয়ে বেরোলে, তাঁরা বাজেয়াপ্ত করবেন। এই খবর চাউর হয়ে যেতে ভয় পেয়ে সব প্রকাশকরা পিছিয়ে গেলেন। শরৎচন্দ্রে অন্যান্য সব বই প্রকাশ করেছেন যে প্রকাশক, ভয় পেয়ে তিনিও

১৯২৩ সালে মধুপুরে ঃ দাঁড়িয়ে আছেন শ্যামাপ্রসাদ
(বসে বাঁদিক থেকে ডানদিকে) তাঁরাদেবী, কমলাদেবী (বড়দিদি), সুধাদেবী
— ১৯০৫-এর ছবি

● নিজের বাড়িতে কাজে ব্যস্ত শ্যামাপ্রসাদ

পিঠটান দিলেন। তখন এগিয়ে এলেন শ্যামাপ্রসাদের পরের ভাই উমাপ্রসাদ। তিনি প্রকাশক হয়ে ছাপলেন পথের দাবী। দুই দাদা রমাপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ দিলেন অভয়। তাঁদের কাছে সবার আগে স্বদেশ। সেই সংকটকালে পথের দাবী গ্রন্থ প্রকাশও তাঁদের কাছে দেশসেবার নামান্তর।

শুধু সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশ নয়, বা সম্পাদনা নয়, শ্যামাপ্রসাদ যাতে উন্নতমানের প্রবন্ধকার হতে পারেন, তার জন্যও সক্রিয় হলেন আশুতোষ। তাকে পাঠালেন বিখ্যাত ক্যাপিটাল পত্রিকার সম্পাদক প্যাট লোভেটের কাছে। বাইশ বছরের তরুণ শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে মুগ্ধ প্যাট লোভেট আশুতোষকে লিখেলেন—

Harold's Cross
33, Theatre Rd
23.7.23
My Dear Sir Asutosh,
I was glad to meet your son yesterday and have a long chat. He is a charming young fellow who immediately conquered my sympathy. He has a worthy journalistic ambition which I will do my best to encourage....

সাতরঙা রামধনু যেমন গড়ে ওঠে নানা রঙে, তেমনি আশুতোষও গড়ে তুললেন তাঁর প্রিয় পুত্রদের নানা বিদ্যায় পারদর্শী করে, যাঁদের মধ্যমণি শ্যামাপ্রসাদ। বাংলার বাঘের ছেলে কালক্রমে হয়ে উঠলেন ভারত-কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

শ্যামাপ্রসাদ (১৯০১-১৯৫৩)

কৈশোর পার হয়ে যৌবনের শুরুতেই পিতা স্যার আশুতোষের অকাল মৃত্যু (১৯২৪) শ্যামাপ্রসাদের জীবনে সূচনা করেছে এক নতুন অধ্যায়ের। এম.এ এবং বি.এল পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে অ্যাডভোকেট হিসাবে নাম নথিভুক্ত করলেও আইনি পেশায় যুক্ত থাকতে পারেন নি। দেশ ও জাতি গঠনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে সমর্পন করেন। মাত্র ২৩ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ''ফেলো'' ও সিন্ডিকেট সদস্য, ২৬ বছর বয়সে লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টের 'বার'-এ যোগ দিলেও, রাষ্ট্রহিত ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। জাতীয় কংগ্রেস মনোনীত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হয়ে বঙ্গীয় আইন সভায় নির্বাচিত হন। পরের বছর, ১৯৩০-এ জাতীয় কংগ্রেস আইনসভা বর্জন করলে, শ্যামাপ্রসাদও আইনসভা থেকে পদত্যাগ করেন এবং নির্দল সদস্যরূপে আবার আইনসভায় প্রবেশ করেন। ১৯৩৩-এ তাঁর পত্নী সুধা দেবীর অকাল প্রয়াণ। ১৯৩৪ সালে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৪-৩৮ দু'দফায় উপাচার্য হয়ে তিনি চল্লিশটি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ন করেন। বাংলা ভাষায় ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা, বাংলা বানান বিধির সংস্কার, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাংলায় ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রণ ইত্যাদি ছিল তাঁর যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি.লিট ও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.ডি উপাধি লাভ করেন।

১৯৪০-এ শিক্ষাবিদ শ্যামাপ্রসাদ নিজেকে মেলে ধরলেন আরো। নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি এবং বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি পদ গ্রহণ করেন। কৃষক প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রগতিশীল মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রির পদ (১৯৪১-৪২) গ্রহণ করেন।

কিন্তু মেদিনীপুরের বিপন্ন জনগণের উপর বৃটিশ সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দেন। বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় (১৯৪৬) ও মেদিনীপুরের ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্তদের সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৪৪-এ হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানে মহ.আলি জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা। কলকাতা ও নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং হিন্দুদের রক্ষার জন্য হিন্দুস্থান জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠন। বিপন্ন উদ্বাস্তুদের সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

● *Madhav Sadashiv Golwalkar Shree Guruji*

১৯৪৬-এ ভারতীয় গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৭-এ ভারত ভাগের সময় পাকিস্তানের কবল থেকে বাঙালি হিন্দুদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ গঠন, তারকেশ্বর আন্দোলন ও পশ্চিমবঙ্গের ভারত ভুক্তি তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান। স্বাধীনতা পরবর্তী গণপরিষদের মন্ত্রিসভায় কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরবরাহ দফতরের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে জাতীয় শিল্প নীতির প্রণয়ন তাঁর উল্লেখযোগ্য কর্মপ্রচেষ্টা। দেশ ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে নৃশংস দাঙ্গা এবং পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তানের মৌন নীতির প্রতিবাদ না করে, আবার প্রধানমন্ত্রি নেহরুর পাকিস্তানের সঙ্গে নতুন চুক্তি (নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি), চুক্তির অসারতা ও নেহরুর পাকিস্তান-তোষণ নীতির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ৫৫টি বাস্তুহারা কলোনীর উদ্বাস্তুদের সংগঠিত করে কলকাতায় সম্মেলন করেন। ১৯৫১ সালের অক্টোবরে দিল্লীতে তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় জনসংঘ দলের প্রতিষ্ঠা। ১৯৫২-তে প্রথম ভারতীয় সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিয়ে দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র থেকে বিজয়ী। লোকসভায় জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠা ও তার নেতৃত্ব গ্রহণ।

● শ্রী বিধান চন্দ্র রায়, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ও সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল

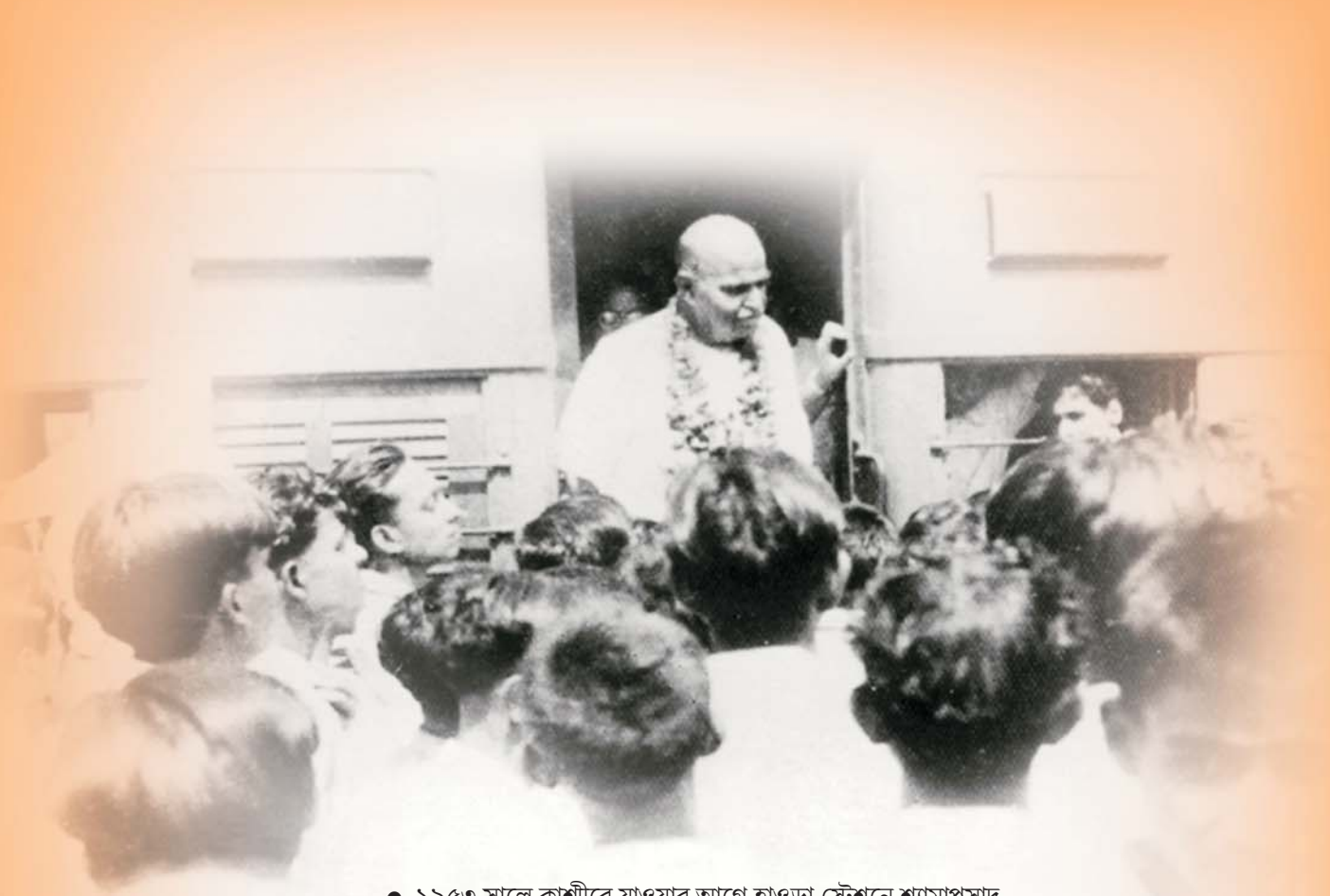

● ১৯৫৩ সালে কাশ্মীরে যাওয়ার আগে হাওড়া স্টেশনে শ্যামাপ্রসাদ

জম্মু-কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তি ও কাশ্মীরে পাকিস্তানের আগ্রাসন ও জম্মুর হিন্দুদের ওপর শেখ আবদুল্লার নৃশংস অত্যাচারের প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রি নেহরু ও আবদুল্লার সঙ্গে নিস্ফল পত্র বিনিময়। জম্মুর আন্দোলনে নিহত হিন্দু শহীদদের চিতাভস্ম নিয়ে দিল্লির চাঁদনি চকে শোভাযাত্রা, গ্রেফতার ও পরে মুক্তি। আবদুল্লা ও নেহরুর কাশ্মীর নীতির প্রতিবাদ, সংবিধানে ৩৭০ ও ৩৫-এ ধারার সংযুক্তির বিরুদ্ধে লোকসভার ভাষণ ও প্রতিবাদ এবং ভারত সরকারের কাশ্মীরে প্রবেশের জন্য পারমিট প্রথা প্রভৃতির জন্য ১১মে (১৯৫৩) কাশ্মীর যাত্রা। 'এক দেশ মে দো প্রধান, দো বিধান, দো নিশান নেহি চলেঙ্গে নেহি চলেঙ্গে' — এই সিদ্ধান্তে অনড় থেকে জাতীয় সংহতি ও ঐক্য রক্ষার স্বার্থে জম্মুতে প্রবেশ। জম্মুর প্রবেশ মুখে গ্রেফতার। ২৩ জুন (১৯৫৩) বন্দীদশায় শ্রীনগরে জীবনাবসান।